ব্যবসায়ের পরিচিতি
(Introduction to Business)

ভূমিকা

মানুষের অভাব অপরিসীম। মানুষের এই অভাববোধ এবং অভাব পূরণের জন্য বিনিময়-ব্যবস্থার সূত্র ধরেই ব্যবসায়ের জন্ম। ব্যবসায় পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে মানুষের অভাব মোচন করে। এই পণ্য বা সেবা ব্যবসায় নিজে উৎপাদন করে অথবা অন্য উৎপাদকের নিকট হতে সংগ্রহ করে বিনিময় করে। মানুষের অভাব যেমন বারবার অনুভূত হয় ব্যবসায় ও তেমনি পুনঃ পুনঃ উহা পূরণ করে। সুতরাং পুনঃ পুনঃ বিনিময়ই ব্যবসায়ের ধর্ম।

ব্যবসায়ের ইংরেজী Business শব্দটি Busy (Busyness) শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে, যার অভিধানগত অর্থ হল- যে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা (Being busy in any work)। কিন্তু ব্যবসায়ের এ অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও অসম্পূর্ণ। কেউ খেলাধুলায়, গানবাজনায় কিংবা নিছক গল্প-গুজবে ব্যস্ত থাকতে পারে। কিন্তু ইহাকে কখনই ব্যবসায় বলা যায় না। অন্যদিকে, মানুষের সকল অর্থনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকাকেও ব্যবসায় বলা যায় না। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অবশ্যই প্রচলিত আইনে বৈধ হতে হবে। অর্থাৎ অবৈধ অর্থনৈতিক তৎপরতাকে ব্যবসায় বলে বিবেচনা করা হয় না। যেমন- চোরাকারবারী, কালোবাজারী। ব্যবসায় হল বৈধ অর্থনৈতিক কার্যাবলী, যার উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা। যেমন- কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, হাস-মুরগী ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং শিল্প পণ্য তৈরী, ডাক্তারী, ওকালতি, ব্যাংকিং প্রভৃতি। সুতরাং মানুষ তার অভাব পূরণের লক্ষ্যে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন, বন্টন ও এর সংশ্লিষ্ট যে সকল বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যস্ত থাকে তাকেই ব্যবসায় বলা হয়ে থাকে। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত সকল কাজই ব্যবসায় হিসেবে গণ্য করা হয়ঃ

ক. পণ্য ও সেবার উৎপাদন, খ. পণ্য বা সেবার ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ বন্টন, গ. উৎপাদন ও বন্টনের সহায়ক কার্যাবলী যেমন- ব্যাংক, বীমা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি।

ব্যবসায়ের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, আওতা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবসায়ের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের আওতা বা পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের গুরুত্ব বা ভূমিকা কতখানি তা অনুধাবন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

ব্যবসায়ের সংজ্ঞা ঃ সাধারণ অর্থে ব্যবসায় হল মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য কমমূল্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে বেশী মূল্যে তা অন্যের নিকট বিক্রয় করা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, ব্যবসায় শুধুমাত্র পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর অর্থ আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। পণ্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর কাছে পৌছে দেয়া পর্যন্ত যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই ব্যবসায়। সুতরাং ব্যাপক অর্থে বলা যায়, বৈধ উপায়ে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে তা দ্বারা ব্যবহারোপযোগী পণ্য-সামগ্রী ও সেবাক্রম উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্যের বন্টন (গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বীমা, ব্যাংকিং, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি) এবং প্রত্যক্ষ সেবা সংক্রান্ত মানবীয় কার্যাবলীকে ব্যবসায় বলে।

ব্যবসায় প্রকৃতি

প্রকৃতি (Nature) হল কোন কিছুর স্বভাব বা সহজাত বৈশিষ্ট্য বা তার ধরন, চলন, বলন, রীতিনীতি প্রভৃতি। মানুষের বহুবিধ অভাব পূরনের লক্ষ্যে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবা কর্মের উৎপাদন, বন্টন, ক্রয়-বিক্রয়, প্রত্যক্ষ সেবাদান সম্পর্কিত পৌনঃ পুনিক কার্যাবলী ব্যবসায়ের সহজাত বৈশিষ্ট্য। নিম্নে ব্যবসায়ের কতগুলো সহজাত বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব বর্ণনা করা হলো, যার দ্বারা ব্যবসায়ের প্রকৃতি ফুটে উঠবে ঃ

১. মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যেই ব্যবসায় পরিচালিত হয়, জনসেবার জন্য নহে।

২. প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ এবং এর দ্বারা মানুষের ব্যবহারোপযোগী পণ্যদ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবসায়ের আরেকটি স্বভাব। মুনাফা অর্জন প্রধান উদ্দেশ্য হলেও মুনাফা না হয়ে লোকসান হতে পারে, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় নাও হতে পারে, পরিবহন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্য নষ্ট বা চুরি হতে পারে। অর্থাৎ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবসায়ের প্রধান সাথী।

৪. অর্থনৈতিক কর্মকলাপের বা লেন-দেনের ধারাবাহিকতা বা পৌনঃ পুনিকতা ব্যবসায়ের আরেকটি অন্যতম সহজাত বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ করে ২/১ টি লেনদেন হলে উহকে ব্যবসায় বলা যায় না। ব্যবসায়িক লেনদেন বা কর্মকান্ড অবশ্যই পৌনঃ পুনিক।

৫. ব্যবসায়ী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই পণ্য বা সেবা উৎপাদন বা সংগ্রহ করে। তাই বিক্রয়ের অভিপ্রায় ব্যবসায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

৬. ব্যবসায়ে পণ্য বা সেবার লেনদেনের অবশ্যই আর্থিক বিনিময় মূল্য থাকে।

৭. পণ্য বা সেবা হলো ব্যবসায়ের প্রধান উপকরণ বা সত্তদা।

৮. ব্যবসায় পরিবর্তনশীলতার সাথে খাপ খাইয়ে চলে।

৯. নায্যমূল্য ও সুবিধাজনক শর্তে গুণগত পণ্য ও সেবার যোগান দেয়া ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১০. ব্যবসায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সমাজের সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান কর।

ব্যবসায়ের আওতা

ব্যবসায়ের আওতা বলতে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্ষেত্র বা কাজের গন্ডিকেই বোঝায়। ব্যবসায়ের আওতা বা পরিধি অত্যান্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত অভাব মিটানোর জন্য পণ্য-দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন, সংগ্রহ ও বন্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় কার্যাবলী আধুনিক ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। মূল্যের বিনিময়ে ভোক্তাকে সেবা পরিবেশনও আধুনিক ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ শিল্পের মাধ্যমে, সংগ্রহ ও বন্টন সংক্রান্ত কাজ বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বন্টনের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বা পণ্য বিনিময় মুখ্য কাজ হিসেবে গণ্য। অন্যান্য কাজ পণ্য বিনিময়ের সহায়ক কার্যাবলী হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আলোকে ব্যবসায়ের আওতাকে নিম্নলিখিত ৪টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়ঃ

১. শিল্প, ২. বাণিজ্য ৩. শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কাজ ও ৪. প্রত্যক্ষ সেবা।

শিল্প

শিল্পের কাজ হলো প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ উত্তোলন, শোধন ও প্রস্তুতকরণ। শিল্পজাত সেবাও শিল্পের আওতাভুক্ত। এছাড়া পণ্যের রূপগত পরিবর্তন সাধন করে নুতন নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাও শিল্পের কাজ। উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও কর্মপ্রচেষ্টায় ভিন্নতার কারণে শিল্পকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা হল ঃ

ক. প্রজনন শিল্প

যে শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন- নার্সারী, হ্যাচারী, হাঁস-মুরগীর খামার, পশুপালন ইত্যাদি।

খ. নিষ্কাশন

যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু হতে সম্পদ উত্তোলন বা আহরণ করা হয় তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। খনিজ পদার্থ উত্তোলন, মৎস্য শিকার ইত্যাদি এরূপ শিল্পের আওতাভুক্ত।

গ. নির্মাণ শিল্প

যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, দালানকোঠা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় তাকে নির্মাণ শিল্প বলে।

ঘ. যান্ত্রিক বা সর্জন শিল্প

শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল বা অর্ধ প্রস্তুত জিনিসকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী চূড়ান্ত পণ্যে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টাকে যান্ত্রিক বা সর্জন শিল্প বলে। এরূপ শিল্পকে বিশ্লেষণ, যৌগিক, প্রক্রিয়াভিক্তিক, সংযোজন ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

ঙ. সেবা পরিবেশক শিল্প

মানুষের জীবনযাত্রা সহজ, নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক করার কাজে নিয়োজিত শিল্পকে সেবা পরিবেশক শিল্প বলে। গ্যাস সরবরাহ, বিদ্যুৎ সংযোগ, টেলিফোন, পানি সরবরাহ ইত্যাদির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান এ শ্রেণীভুক্ত।

বাণিজ্য

বাণিজ্যের কাজ হলো শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বন্টন করা এবং বন্টন কালে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর করে ভোগ কারীর নিকট পণ্য পৌছে দেয়া। বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, কালগত, ঝুঁকিগত, অর্থগত, স্থানগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে পণ্যসামগ্রী ভোগকারীর নিকট পৌছানো হয়। বাণিজ্যের আওতা নিম্নরূপ ঃ

ক. পণ্য বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়

পণ্য দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে বিনিময় বলে। বিনিময়ের মাধ্যমে পন্যের মালিকানা হস্তারিত হয় এবং ব্যক্তিগত বা স্বত্বগত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। পণ্য বিনিময় দু'প্রকার ঃ

১. অভ্যন্তরীণ পণ্য বিনিময়

দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে যে বিনিময় সংঘটিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ বিনিময় বলে। এটা আবার দুধরনের হয়। যথা- পাইকারী, বিনিময় ও খুচরা বিনিময়।

২. বৈদেশিক পণ্য বিনিময়

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের সাথে অন্য একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের পণ্য বিনিময় হলে তাকে বৈদেশিক পণ্য বিনিময় বরে। উহা আবার তিন ধরনের। যথা- আমদানী, রপ্তানী, পুনঃরপ্তানী।

খ. পরিবহন

পরিবহনের মাধ্যমে পণ্যের স্থানগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়। যেমন- বরিশালে উৎপাদিত চাল ঢাকায় সবরাহ করা হয়।

গ. বীমা

পণ্য সামগ্রী উৎপাদন এবং উৎপাদনের পর ভোক্তার কাছে পৌছানের ক্ষেত্রে যে সকল ঝুঁকির সমুক্ষীণ হয়, বীমার মাধ্যমে সেই ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়।

ঘ. গুদামজাতকরণ

উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সুবিধাজনক সময়ে বিক্রয়ের জন্য গুদাম ঘরে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। পণ্য সামগ্রী যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করে সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়।

ঙ. ব্যাংকিং

ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় স্থায়ী ও চলতি মূলধন সরবরাহ করে ব্যাংকসমূহ বাণিজ্যের অর্থগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কাজ

শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা করে এ ধরনের বিভিন্ন কাজও ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। যেমন- পণ্য গবেষণা, বাজার গবেষণা, কৌশল উদ্ভাবন, বাজারজাত করণ প্রসার ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ সেবা

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীনপেশায় নিয়োজিত ডাক্তারী ব্যবসায় যেমন ক্লিনিক ও হাসপাতাল, আইন ব্যবসায়ী যেমন- এটর্নীফার্ম, ইঞ্জিনিয়ারি ফার্ম ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সেবা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান সঙ্গত কারণেই ব্যবসায়ের আওতায় আসে। উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ব্যবসায়ের আওতা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে এর আওতা এত ব্যাপক ছিলনা। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এর আওতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর প্রসার আরও বাড়বে, এতে কোন সন্দেহ নেই। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে ব্যবসায়ের আওতা বা পরিধি তুলে ধরা হল ঃ

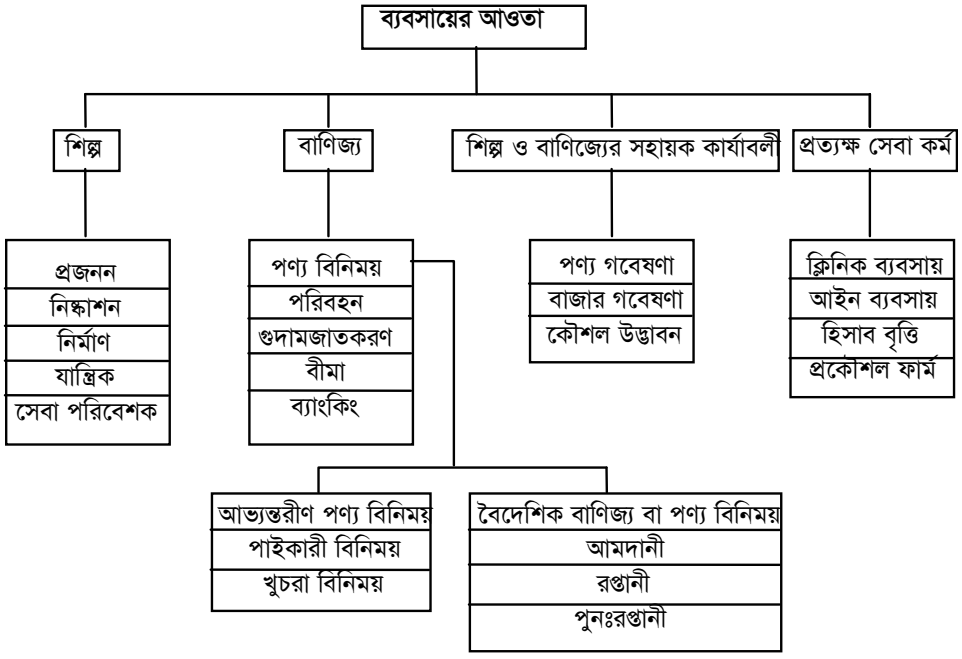

চিত্র ঃ ব্যবসায়ের আওতা

ব্যবসায়ের গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশে, প্রতিটি সমাজে, প্রতিটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যবসায়ের গুরুত্ব এত বেশী যে, এ সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করা হবে বাহুল্যতা। বিশ্বের রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুই ব্যবসায় দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। চলমান বিশ্বের সব কিছুই থেমে যাবে যদি ব্যবসায় থেমে যায়। বিশ্বের প্রতিটি মানুষই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ব্যবসায় দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

অন্যদিকে, জীবিকা অর্জনের সবচেয়ে স্বাধীন, সহজতম ও সম্মান জনক উপায় হলো ব্যবসায়। ব্যবসায়ের মাধ্যমে ধন সম্পদ অর্জন করে নিজের, সমাজের তথা দেশের অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব। বিভিন্ন ধর্মেও নিজের, সমাজের এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ব্যবসায়কে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর অর্থাৎ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও রিজিক অন্বেষণের চেষ্টা কর।" পবিত্র হাদিছে সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীকে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সম মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। হাদিছ শরীফে আরও বলা হয়েছে যে, "জীবিকার দশ ভাগের নয় ভাগ আসে ব্যবসায় থেকে এবং সৎ ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসায় করা একটি উত্তম ইবাদত।" আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নিজেও ব্যবসায়-বাণিজ্য করেছেন। কাজেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য ব্যবসায় একটি উত্তম হাতিয়ার।

অপর দিকে, আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো সে সব দেশের উন্নতির মূলে রয়েছে ব্যবসায় তথা শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি। ব্যবসায় করেই ইংরেজরা দু'শ বছর আমাদের শাসন ও শোষণ করেছে। বর্তমান বিশ্বেও যে সব দেশে পৃথিবীতে আদিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করছে তাদেরও মূল শক্তি হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্য। বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ না থাকলেও ব্যবসায়িক তথা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যাদি চলছে। গুরুত্ব পাচ্ছে দেশে দেশে অর্থনৈতিক কুটনীতি বা Economic Diplomacy. ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমেই চলছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা। কাজেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কল্যাণে ব্যবসায়ের গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না। তবুও বিভিন্ন দিক থেকে ব্যবসায়ের গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হল ঃ

১. দেশের ছড়ানো ছিটানো সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব কেবল ব্যবসায়ের মাধ্যমেই।

২. ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ, আর বিনিয়োগ আসে সঞ্চয় থেকে। কাজেই ব্যবসায় জন্যই সঞ্চয়ে উৎসাহ আসে।

৩. ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আয় ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, ফলে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়।

৪. ব্যবসায় প্রয়োজনে কাঁচামাল ও পণ্য আনা নেওয়ার জন্য সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে। বৃটিশরা পদ্মা নদীর উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ তৈরী করে রেল ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছিল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই।

৫. ব্যবসায়ের ফলে ব্যক্তির কার্যদক্ষতা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সহজ হয়।

৬. ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হয়। ফলশ্রুতিতে মানুষ পায় কম দামে উন্নতমানের নিত্যনুতন পণ্য।

৭. ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে সরকারের রাজস্ব আদায় প্রচুর বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ এর সুফল ভোগ করে।

৮. ব্যবসায়-বাণিজ্যের বদৌলতে পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন স্থানে উৎপাদিত যে কোন পণ্য আমরা ঘরে বসেই পাচ্ছি। এতে আমাদের জীবন হয়েছে সহজ, আরামদায়ক ও উন্নত।

৯. নিজের ও অন্যদের কর্মসংস্থানের সবচেয়ে সহজ ও উত্তম উপায় হলো ব্যবসায়-বাণিজ্য। আমাদের মত দেশের মারাত্মক বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।

১০. ব্যবসায়ের সাহচর্যে ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের কারণে দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গড়ে উঠে। যাদের ভূমিকার কারণে দেশের অর্থনীতি ও সমাজ উপকৃত হয়। বলা হয় "একশত ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে একজন উদ্যোক্তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

১১. ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান উন্নত হয়।

১২. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ও বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সু সম্পর্ক গড়েউঠে। এতে করে জ্ঞানার্জন ও পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

উপরের আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে, ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো ব্যবসায়। দ্রুত ধন-সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র সহজ পথ হলো ব্যবসায়। ব্যবসায়ের মাধ্যমেই শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী লোক

তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফোরাম বা সমিতি যেমন- SAPTA, NAFTA, EEC, ASEAN প্রভৃতি গঠন করছে।

পাঠ-সংক্ষেপ

মানুষের অভাব বোধ ও অভাব পূরণের জন্য বিনিময় ব্যবস্থার সূত্র ধরেই ব্যবসায়ের জন্ম।
Business শব্দের আক্ষরিক অর্থ- "কোন কাজে ব্যস্ত থাকা" (Being busy in any activity).
মুনাফা অর্জরে লক্ষ্যে পণ্য ও সেবা কর্মের উৎপাদন, বন্টন, ক্রয়-বিক্রয়, প্রত্যক্ষ সেবাদান সম্পর্কিত পৌনঃ পুনিক বৈধ কার্যাবলীকে ব্যবসায় বলে।
মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।
ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবসায়ের নিত্য সাথী।
লেনদেন ধারাবাহিকতা বা পৌনঃ পুনিকতা ব্যবসায়ের সহজাত বৈশিষ্ট্য।
ব্যবসায়ের প্রধান উপকরণ বা সওদা হল পণ্য বা সেবা।
পণ্য বা সেবার লেনদেনে অবশ্যই আর্থিক বিনিময় হতে হবে।
পণ্য ও সেবা উৎপাদন, সংগ্রহ ও বন্টন এবং এদের সহায়ক যাবতীয় কার্যাবলী আধুনিক ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত।
মূল্যের বিনিময়ে ভোক্তাকে প্রত্যক্ষ সেবা প্রদানও ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত।
বিশ্বের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতি সব কিছুই ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা প্রভাবিত।
সমাজের প্রতিটি মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ব্যবসায় দ্বারা উপকৃত।
জীবিকা অর্জনের সবচেয়ে স্বাধীন, সহজতম ও সম্মানজনক উপায় হচ্ছে ব্যবসায়।
সৎ ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসায় করা একটি উত্তম ইবাদত।
সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর মর্যাদা নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সমতূল্য।

পাঠোত্তর মূল্যায় ঃ ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. ব্যবসায়ের মূল বা প্রথম উদ্দেশ্য কি?
ক. মানুষের সেবা করা; খ. ভাল পণ্য উৎপাদন করা;
গ. মুনাফা অর্জন করা; ঘ. কমমূল্য ধার্য করা।

২. Business এর বাংলা শব্দ কি?
ক. কারবার খ. বাণিজ্য
গ. ক্রয়-বিক্রয় ঘ. ব্যবসায়

৩. জীবিকা অর্জনের স্বাধীন পেশা কি?
ক. চাকুরী করা খ. ব্যবসায় করা গ. মানুষের সেবা করা ঘ. বিদেশ ভ্রমণ করা

৪. ব্যবসায়ের প্রধান উপরকণ কি?
ক. পণ্য ও সেবা খ. টাকা-পয়সা গ. কাঁচামাল ঘ. বিল্ডিং

৫. কোনটি ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত নয়?
ক. শিল্প খ. ক্রয়-বিক্রয়
গ. কালোবাজারী ঘ. প্রত্যক্ষ সেবা

৬. ঝুঁকিগত বাঁধা দূর হয় কিসের মাধ্যমে?
ক. বীমা খ. ব্যাংক
গ. পরিবহন ঘ. গুদামজাতকরণ

৭. ব্যক্তিগত বা সত্ত্বগত ধাঁবা দূর হয় কিসের মাধ্যমে?
ক. বীমা খ. ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়
গ. ব্যাংক ঘ. পরিবহন

৮. পোলট্রী ও হ্যাচারী কি ধরনের শিল্প?
ক. প্রজনন খ. নিষ্কাশন
গ. প্রক্রিয়া ভিত্তিক ঘ. সেবা পরিবেশ

৯. সত্যবাদী ও ন্যায়পন্থী ব্যবসায়ীর মর্যাদা কাদের সমতুল্য?
ক. নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের খ. রাষ্ট্রপতির
গ. রাজনীতিবিদদের ঘ. চলচ্চিত্র নায়কদের।

পাঠ ২ ব্যবসায়ের প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবসায়ের প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- শিল্পের সংজ্ঞা ও এর শ্রেণী বিভাগ বা আওতা জানতে পারবেন।
- বাণিজ্যের সংজ্ঞা-এর শ্রেণীবিভাগ বা কার্যাবলী জানতে পারবেন।
- বাণিজ্যের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং উহা দূরীকরণের উপায় জানতে পারবেন।
- শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলী সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ সেবামূলক কাজ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের সাথে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য-বিনিময়ের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যবসায়ের প্রকারভেদ ঃ ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যবসায়কে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. শিল্প ২. বাণিজ্য ৩. শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলী ৪. প্রত্যক্ষ সেবা।

উক্ত প্রতিটি ভাগকে আবার বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে এই প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ দেখানো হলোঃ

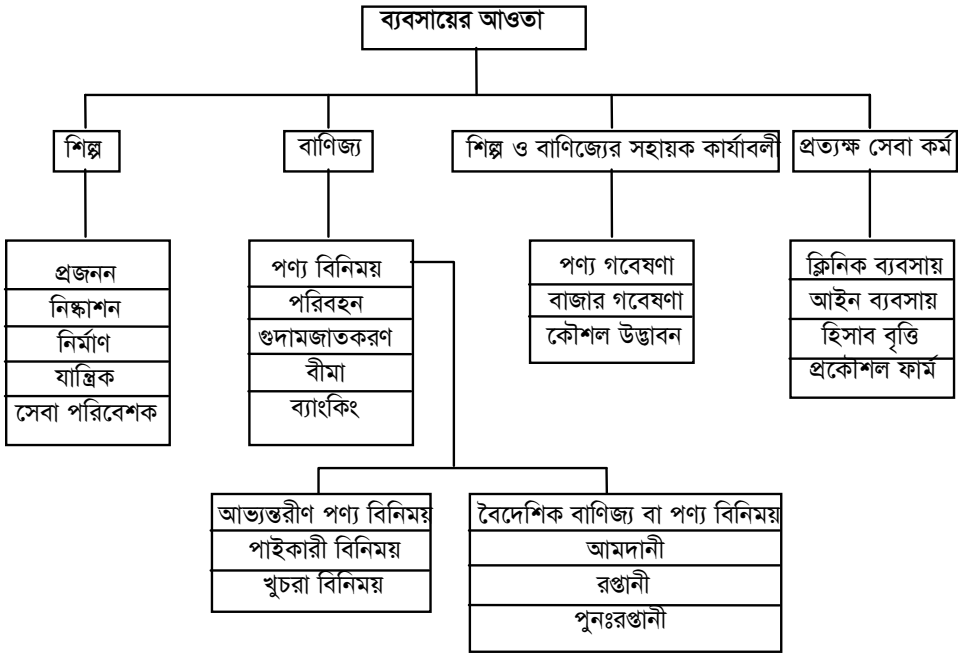

চিত্র ঃ ব্যবসায়ের প্রকারভেদ

নিম্নে প্রতিটি শ্রেণীকে বা প্রকারকে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হলোঃ

শিল্প

যে প্রক্রিয়া বা কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ এবং বিভিন্ন উপায়ে ও পর্যায়ে আহরিত সম্পদের আকার বা রূপগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে শিল্প বলে। যেমন- বন থেকে কাঠ সংগ্রহ - সংগৃহীত কাঠকে স মিলে চেড়ানো হয় - চেড়ানো কাঠ থেকে প্রক্রিয়ার ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফার্ণিচার তৈরী করা হয় - ফার্নিচার মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। বনের কাঠ থেকে ফার্নিচার তৈরীর এই পুরো প্রক্রিয়াকেই শিল্প বলে।

শিল্পের শ্রেণী বিভাগ বা প্রকারভেদ

শিল্পকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক. প্রাথমিক শিল্প

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ভাবে যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে প্রাথমিক শিল্প বলে। এগুলো হলোঃ

১. কৃষি শিল্প

মাটিতে শস্যসামগ্রী যেমন- ধান, পাট, আখ, শাক সবজি ইত্যাদির উৎপাদনকে কৃষি শিল্প বলে।

২. প্রজনন শিল্প

প্রজনন অর্থ জন্মদান প্রক্রিয়ায় পুনরায় সম্পদ সৃষ্টি করা। সুতরাং যে শিল্প উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন- পশুপালন, মৎস্য চাষ, হাস-মুরগীর পালন, নার্সারী ইত্যাদি।

৩. নিষ্কাশন শিল্প

যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভুগর্ভ, পানি বা বায়ু হতে সম্পদ উত্তোলন বা আহরণ করা হয় তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। যেমন খনি থেকে গ্যাস উত্তোলন, সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি।

খ. গৌণ শিল্প / দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্প

প্রাথমিক শিল্প হতে প্রাপ্ত সম্পদ সমূহকে আরও ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাকে গৌণ শিল্প বলে। গৌণ শিল্পের আওতাভুক্ত শিল্পগুলি নিম্নরূপঃ

১. উৎপাদন শিল্প

শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল বা আধা-প্রস্তুত জিনিসকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী চূড়ান্ত পণ্যে প্রস্তুত করা প্রচেষ্টাকে যান্ত্রিক বা উৎপাদন বা সর্জন শিল্প বলে। যেমন অশোধিত খনিজ তেলকে পরিশোধনের মাধ্যমে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদিতে পরিণত করে, আখ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে চিনি, গুর, চিছরি ইত্যাদি উৎপাদনে করা যায়। উৎপাদন শিল্পকে আবার নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

বিশ্লেষণ শিল্প

একই পদার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একাধিক পদার্থ বা পণ্য সামগ্রী তৈরীর প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ শিল্প বলে। যেমন- খনিজ কয়লা হতে কোক কয়লা, ন্যাপথলিন, আলকাতরা ইত্যাদি প্রস্তুত করা এ শিল্পের মধ্যে পড়ে।

যৌগিক শিল্প

এরূপ শিল্পে পৃথক পৃথক পদার্থের সংমিশ্রণে নতুন দ্রব্য তৈরী হয। যেমন- লৌহ আকরিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ চুনাপাথর, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি পদার্থের মিশ্রণ ঘটিয়ে ইস্পাত তৈরী করা হয়।

প্রক্রিয়া ভিত্তিক শিল্প

যে শিল্পের কাঁচামাল বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত হয়, তাকে প্রক্রিয়া ভিত্তিক শিল্প বলে। যেমন, তুলা থেকে সুতা হয়, সুতা থেকে কাপর তৈরী, এ শিল্পের উদাহরণ।

সংযোজন শিল্প

বিভিন্ন শিল্পে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎপাদিত উপকরণ বা অংশ বিশেষকে একত্রিত করে নতুন ভাবে চূড়ান্ত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করাকে সংযোজন শিল্প বলে। যেমন, মটরগাড়ী, রেল ইঞ্জিন, কম্পিউটার ইত্যাদি। চূড়ান্ত পণ্য তৈরী করতে বিভিন্ন উপকরণ বা অংশকে একত্রিত করে কাজে লাগান হয়।

সংযুক্ত শিল্প

এ জাতীয় শিল্পে বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রক্রিয়ার একই সাথে সমন্বয় ঘটে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এর উদাহরণ।

নির্মাণ শিল্প

যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, ব্রিজ দালান কোঠা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় তাকে নির্মাণ শিল্প বলে।

৩. সেবা পরিবেশক শিল্প

মানুষের জীবনকে সহজ, নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক করায় কাজে অর্থাৎ জন কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত শিল্পকে সেবা পরিবেশক শিল্প বলে। গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, প্রকাশনা, জনপরিবহন ইত্যাদি সরবরাহ এই শিল্পের আওতাভুক্ত।

বিঃ দ্রঃ শিল্পের উক্ত প্রকারভেদ বা শ্রেণীভাগ শিল্পের আওতা, পরিধি, বিষয়বস্তু বা ক্ষেত্র হিসেবেও বিবেচিত হয়।

বাণিজ্য

বাণিজ্য ব্যবসায়ের অন্যতম শাখা। সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের পর থেকে বাণিজ্যের কার্যক্রম শুরু হয়। অর্থাৎ শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত পথিমধ্যে যে সব বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আসে তা দূরীকরণ করার যাবতীয় কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলে। আবার কৃষকের নিকট হতে পাট সংগ্রহ করে শিল্প বা মিল মালিকের নিকট পরবর্তী অধিক উৎপাদনের জন্য সরবরাহ করাও বাণিজ্যের আওতাভুক্ত হবে। অতএব, এক শিল্প হতে উৎপাদিত সামগ্রী পরবর্তী উৎপাদনের জন্য অন্য শিল্পে অথবা শিল্পে উৎপাদিত ভোগ্য পণ্য প্রকৃত ভোগকারীর নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় তার সমষ্টিকেই বাণিজ্য বলে।

মনে করুন, আপনি দর্শনা চিনি কল থেকে ১০০ বস্তা চিনি কিনলেন। আপনার উদ্দেশ্য, বেশী দামে ভোক্তার নিকট উক্ত চিনি বিক্রয় করে লাভবান হওয়া, উক্ত চিনি মিল থেকে ক্রয়ের পর ভোক্তার নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই কতগুলো সমস্যায় পড়বেন। যেমন- চিনির বস্তাগুলো কিভাবে দূরদুরান্তের ভোক্তার নিকট নিয়ে যাবেন, ঐ গুলি নেওয়ার পথে চুরি, ছিনতাই হতে পারে বা নষ্ট ও হতে পারে, ঐ চিনি কোথায় রাখবেন, ঐ চিনি বিক্রয়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা নিবেন, উক্ত কাজগুলো করার জন্য অর্থের অভাব হলে কি করবেন, ভোক্তাদের নিকট বিক্রয়ের কাজটি কে করবে ইত্যাদি। অর্থাৎ পণ্য (চিনি) উৎপাদনের পর ভোক্তার নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে আপনি স্থানগত, ঝুঁকিগত, কালগত, অর্থগত, প্রচার গত ও ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়বেন। বাণিজ্য আপনাকে যথাক্রমে পরিবহনের মাধ্যমে, বীমার মাধ্যমে, গুদামজাতকরনের মাধ্যমে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে, বাজারজাত করনের মাধ্যমে, সর্বশেষ ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে উক্ত সমস্যা সমূহের সমাধান দেবে।

উক্ত আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত পণ্য বন্টন পথে উদ্ভূত স্থানগত, কালগত, ঝুঁকিগত, অর্থসংস্থানগত, সময় গত, ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের যাবতীয় কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলে।

বাণিজ্যের প্রকারভেদ

নিম্নে বাণিজ্যের প্রকারভেদ চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল এবং চিত্রে বর্ণিত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

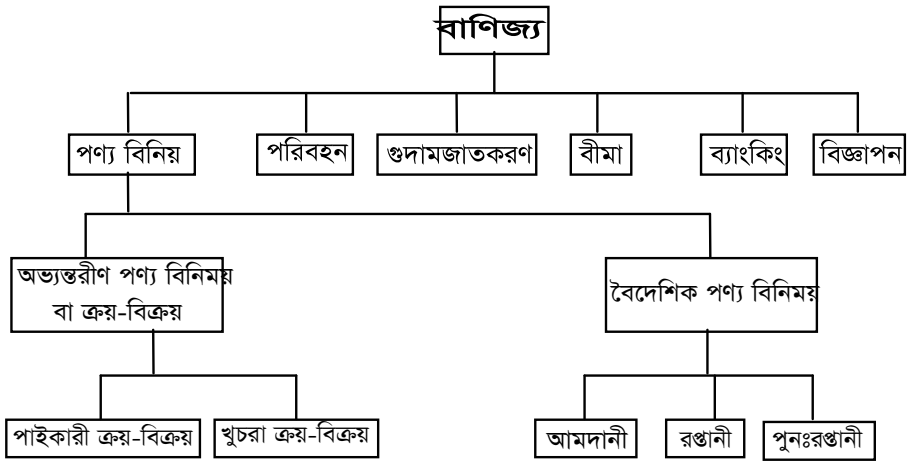

চিত্র ঃ বাণিজ্যের প্রকারভেদ ও আওতা।

ক. পণ্য বিনিময়

উৎপাদনকারী ও ভোগকারী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থাকায় তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকে না। বাণিজ্য ব্যক্তিগত যোগাযোগের এই প্রতিবন্ধকতা পণ্য বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে দূর করে। পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর কে পণ্য বিনিময় বলে। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা হস্তারিত হয়। পণ্য বিনিময় দুই প্রকার। যথা-

১. অভ্যন্তরীণ পণ্য বিনিময় বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

একটি দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে যে ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পাদিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। লেন-দেনের প্রকৃতি অনুযায়ী এরূপ বাণিজ্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা করা যায় ঃ

পাইকারী বাণিজ্য বা ক্রয়- বিক্রয় ঃ

উৎপাদনকারী বা আমদানীকারকদের নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বেশী পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে বেশী মূল্যে অল্প অল্প করে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করাকে পাইকারী ক্রয়-বিক্রয় বলে।

খুচরা ক্রয়-বিক্রয়

পাইকারী বিক্রেতার নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামে বেশী পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে অল্প অল্প পুনরায় ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করাকে খুচরা ক্রয়-বিক্রয় বা খুচরা বাণিজ্য বলে।

২. বৈদেশিক পণ্য বিনিময় বা বৈদেশিক বাণিজ্য

এক সার্বভৌম দেশের সাথে অন্য সার্বভৌম দেমের বা এক সার্বভৌম দেশের ব্যবসায়ীর সাথে অন্য সার্বভৌম দেমের ব্যবসায়ীর যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক ক্রয়-বিক্রয় বলে। বৈদেশিক বাণিজ্য তিন পারেঃ

আমদানী

বিদেশ থেকে পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে নিজ দেশে আনাকে আমদানী বলে যেমন- বাংলাদেশ বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে থাকে।

রপ্তানী

বিদেশের নিকট বা বিদেশের কোন ব্যবসায়ীর নিকট নিজ দেশের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করাকে রপ্তানী বলে। যেমন- বাংলাদেশ, পাট, চা, তামাক, চামড়া বিদেশে রপ্তানী করে থাকে।

পুনঃ রপ্তানী

বিদেশ থেকে পণ্য সামগ্রী আমদানী করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানী করাকে পুনঃরপ্তানী বলে। যেমন- বাংলাদেশে তৈরী পোশাকের কাঁচামাল আমদানী করে উহা দ্বারা চূড়ান্ত ভাবে তৈরী পোশাক আবার বিদেশে রপ্তানী করে তাকে।

খ. পরিবহন

উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে স্থানগত দূরত্ব বাণিজ্যের একটি বড় বাঁধা। বিভিন্ন ধরনের পরিবহন যেমন- সড়ক পরিবহন, রেল পরিবহন, নৌ পরিবহন, আকাশ পরিবহন ব্যবস্থা উৎপাদিত সামগ্রী মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর হাত ঘুরে প্রকৃত ভোগকারীর নিকট পৌছানোর মাধ্যমে বাণিজ্যের উক্ত স্থানগত বাঁধা দূর করছে। যেমন- ঝিনাইদহে উৎপাদিত কলা পাইকারী ক্রেতারা সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে ঢাকায় ভোক্তাদের নিকট পৌছে দিচ্ছে।

গ. গুদামজাতকরণ

গুদামজাতকরণ বাণিজ্যের কালগত বা সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল কিছু সময় গুদাম ঘরে মজুত রাখতে হয়। আবার উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের পর হতে ভোগের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ উৎপাদিত সামগ্রী সংগে সংগে বিক্রয় হয় না বা উৎপাদিত হয় এক সময়ে এবং ব্যবহার হয় সারা বৎসর। এই যে সময়ের পার্থক্য এটি বাণিজ্যের একটি বড় বাঁধা। গুদামজাত করনের মাধ্যমে এই বাঁধা দূরীভূত হয়। এর মাধ্যমে আমাদানী কৃত বা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী মজুদ রেখে প্রয়োজনের সময় ভোক্তাকে যোগান দেয়া হয়।

ঘ. বীমা

ঝুঁকি ব্যবসায়ের নিত্য সাথী। পণ্য পরিবহনের সময়, গুদামে থাকা অবস্থায়, চুরি হতে পারে, নষ্ট হতে পারে, ছিনতাই হতে পারে, আগুনে পুড়ে যেতে পারে, নৌকা বা জাহাজ ডুবী হতে পারে। কাজেই অদৃশ্য এই ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা। বীমা বাণিজ্যের এই ঝুঁকিগত বাঁধা দূর করতে পারে। সামান্য প্রিমিয়াম প্রদান করে বিভিন্ন বীমা যেমন- অগ্নিবীমা, নৌবীমা, জীবন বীমা সহ বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ করে সহজেই ঝুঁকি দূর করা যায়।

ঙ. ব্যাংকিং

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই অর্থ ছাড়া চলতে পারে না। তাছাড়া, আর্থিক নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু লেনদেনের উপর ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন নির্ভর করে। ব্যাংক সুদের বিনিময়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সরবরাহ করে অর্থ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

চ. বিজ্ঞাপন

ভাল জিনিস উৎপাদন করলেই হবে না বা দোকান সাজিয়ে রাখলেই চলবে না। ভাল জিনিসের খবর ভোক্তাদের জানাতে হবে। জিনিসের গুণ, ব্যবহার, দাম ইত্যাদি জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। কেননা প্রচারেই প্রসার। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্য সম্বন্ধে ক্রেতাদের অজ্ঞতা দূর করে বিক্রয় বাড়ানো যায়।

বাণিজ্যের বিভিন্ন বাঁধা এবং বাঁধা দূরীকরণের উপায়

বাণিজ্যের কাজ হলো পণ্য দ্রব্য ও সেবা কর্মসমূহ বিভিন্ন উৎস হতে সংগ্রহ করে নিরাপদে ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া। কিন্তু পণ্য-দ্রব্য বন্টন কালে ব্যবসায়ীকে নানান ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। নিম্নে বাণিজ্যের বিভিন্ন বাঁধা এবং একই সাথে বাঁধাগুলো অপসারণের প্রক্রিয়ায় আলোচনা করা হলো ঃ

১. ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা

পণ্য দ্রব্য উৎপাদিত হয় এক স্থানে এবং ভোগ করা হয় বিভিন্ন স্থানে। ফলে উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। এর ফলে যোগাযোগে ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পণ্য বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় বাণিজ্যের এই ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে থাকে। উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়া যোগাযোগ ঘটিয়ে ব্যক্তিগত বাঁধা দূর করে।

২. স্থানগত প্রতিবন্ধকতা

পণ্যের উৎপাদন স্থান ও ভোগের স্থান সাধারণত এক জায়গায় হয় না। এক স্থানে উৎপাদিত পণ্য দেশের সমস্ত জায়গায় এমনকি বিদেশেও ব্যবহার বা ভোগ হয়। ফলে উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে স্থানগত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য বিভিন্ন ধরনের পরিবহন যেমন সড়ক পরিবহন, রেল পরিবহন, নৌ পরিবহন, আকাশ পরিবহন, পাইপ লাইন এর মাধ্যমে পণ্য-দ্রব্যের স্থানগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

৩. সময়গত প্রতিবন্ধকতা

পণ্যের উৎপাদন ও ভোগের সময়ের মধ্যে পার্থক্যজনিত কারণে সময়গত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। কেননা উৎপাদনে সাথে সব পণ্য বিক্রয় হয় না বা ভোগ করা হয় না। কোন কোন পণ্য উৎপাদন হয় বৎসরে এক মৌসুমে কিন্তু ব্যবহৃত হয় সারা বৎসর যেমন- চিনি বা গুড়, আবার কোন কোন পণ্য উৎপাদন হয় সারা বৎসর কিন্তু ব্যবহৃত হয় এক মৌসুমে যেমন- শীতকালে গরম কাপর ব্যবহৃত হয় কিন্তু উৎপাদন হয় সারা বৎসর। উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে এই সময়ের পার্থক্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা।

পণ্যের গুদামজাতকরণের মাধ্যমে বাণিজ্য সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। অর্থাৎ উৎপাদনের সময় হতে ভোগ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পণ্য দ্রব্যগুলোকে গুদামজাত করে বাণিজ্য পণ্যের সময়গত ধারা দূর করে।

৪. ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা

বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবসায়ের নিত্য সাথী, যা ব্যবসায়ের জন্য বড় ধরনের অদৃশ্য সমস্যা। যেমন- পরিবহন কালে বা গুদামে থাকা কালে চুরি, ডাকাতি, আগুন লাগা, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এতে করে ব্যবসায়ীকে সব সময় ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হয়।

সামান্য প্রিমিয়াম প্রদান করে বিভিন্ন বীমা পলিসি যেমন- অগ্নিবীমা পলিসি, নৌবীমা পলিসি, দূর্ঘটনা বীমা পলিসি প্রভৃতি বহুবিধ পলিসি গ্রহণ করে বাণিজ্য সহজেই ব্যবসায়ের ঝুঁকি দূর করতে পারে। অর্থাৎ বীমার মাধ্যমে বাণিজ্যের ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব।

৫. অর্থ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা

অর্থ হল ব্যবসায়ের রক্ত বা জীবনী শক্তি (Life Blood) কিন্তু কোন ব্যবসায়ীর পক্ষেই ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। অপর দিকে, বিক্রীত পণ্যের মূল্য ঠিকমত সংগ্রহ নাও হতে পারে। এসব কারণ ব্যবসার জন্য অর্থগত সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৬. উৎপাদিত পণ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা

ভালপণ্য আমদানী বা উৎপাদন করলেই হয় না, পণ্যের গুণ, ব্যবহার, মূল্য, ব্রান্ড প্রভৃতি সম্বন্ধে ভোক্তাদের জানাতে হয়। কিন্তু সফলভাবে পণ্য তথ্য ভোক্তাদের জানানো একটি কঠিন কাজ।

বাণিজ্য আধুনিক কৌশল প্রয়োগ করে পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ব্যবস্থা করে সহজেই ভোক্তাদের পণ্য সম্বন্ধে জানাতে পারে।

শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলী

শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা করে এ ধরনের বিভিন্ন কাজ ও ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। যেমন- পণ্য গবেষণা, বাজার গবেষণা, চাহিদা সৃষ্টি, উন্নত উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ সেবা

অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীগণ প্রত্যক্ষ ভাবে সেবাকর্ম বিক্রয় করেন। যেমন- ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট ব্যবস্থাপকীয় সমস্যার সমাধানের পরামর্শদেন, কণ্ঠশিল্পী গান গায়, চাটার্ড একাউনটেন্ট হিসাব নিরীক্ষা করে, ইঞ্জিনিয়ার প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেয়, আইনজীবী মক্কেলকে আইন পরামর্শ দেয়, ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করে অর্থ উপার্জনন করে। উক্ত প্রত্যক্ষ সেবা বিক্রয়কারী পেশাজীবীদের কার্যাবলী ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবসায়ের সাথে শিল্প, বাণিজ্য এবং পণ্য বিনিময়ের সম্পর্ক / তুলনা

ব্যবসায় সমাজ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন ও বন্টনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের অভাব মোচন ও মুনাফা অর্জন এর লক্ষ্য। শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময় ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশ। অর্থাৎ ব্যবসায়ের সাথে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যবসায়কে যদি সামগ্রিক ভাবে একটি বৃক্ষ হিসাবে চিন্তা করেন, তাহলে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময় হবে ঐ বৃক্ষের শাখা, পাতা, ফুল বা ফল। ফল ছাড়া যেমন গাছের জীবন অর্থহীন, পাতা ছাড়া যেমন গাছ শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না, অর্থাৎ গাছ বাঁচতে পারে না, তদ্রুপ, শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময় ছাড়া ব্যবসায় তার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না। অতএব ব্যবসায়ের সাথে শিল্প বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময়ের সম্পর্ক অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। নিম্নে ব্যবসায়ের সাথে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময়ের তুলনামূলক সম্পর্ক তুলে ধরা হল ঃ

১. সংজ্ঞাগত সম্পর্ক

ব্যবসায়

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন, বন্টন ও বন্টন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলীকে ব্যবসায় বলে।

শিল্প

প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে মানুষের ব্যবহারোপযোগী পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে শিল্প বলে।

বাণিজ্য

উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা ভোক্তার নিকট পৌছানোর জন্য যে সমস্ত কাজ করতে হয়, তার সমষ্টিকে বাণিজ্য বলে।

পণ্য-বিনিময়

উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যদ্রব্য ও সেবাসমূহ ক্রেতার নিকট বিক্রয় করাকে পণ্য বিনিময় বলে। পণ্য বিনিময় বাণিজ্যের একটি শাখা এবং এর দ্বারা বাণিজ্যের ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা দূর হয়।

২. কার্যগত সম্পর্ক

ব্যবসায়ের কাজ উৎপাদন ও বন্টন উভয়ের সাথে সম্পর্কিত। শিল্পের কাজ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিতা বাণিজ্যের কাজ বন্টনের সাথে সম্পর্কিতা পণ্য-বিনিময়ের কাজ হলো বন্টনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঁধা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে দূর করা।

৩. আওতাগত সম্পর্ক

শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের আওতাধীন। পণ্য বিনিময় বাণিজ্যের আওতাধীন।

৪. উদ্দেশ্যগত সম্পর্ক

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য হল মানুষের অভাব মোচন করা। শিল্প-বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময় ব্যবসায়ের অধীনে একই ধরনের উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করে।

৫. অবস্থানগত সম্পর্ক

ব্যবসায় শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময়ের অবস্থানও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ব্যবসায়ের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য একীভূত। পণ্য বিনিময় বাণিজ্যের অধীনে ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত।

৬. সহযোগিতামূলক সম্পর্ক

পণ্য বিনিময় বন্টন তথা বাণিজ্যিকে সহায়তা করে। বাণিজ্য উৎপাদিত পণ্য বন্টনের মাধ্যমে শিল্পকে সহায়তা করে। আর পণ্য-বিনিময়, বাণিজ্য, শিল্প সকলে মিলে ব্যবসায়কে শক্তিশালী করে।

৭. নির্ভরশীলতার সম্পর্ক

পণ্য-বিনিময় বা ক্রয় বিক্রয় ছাড়া বন্টন সম্ভব নয়। বন্টন বা বাণিজ্য ছাড়া উৎপাদন তথা শিল্প অর্থহীন, আবার শিল্প ছাড়া বাণিজ্য অর্থহীন। একই ভাবে ব্যবসায় তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উপর নির্ভরশীল।

উপরোক্ত আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ব্যবসায়ের অধীনে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য-বিনিময় স্ব স্ব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতায় কার্য সম্পাদন করে এবং পরস্পর এক ও অভিন্ন সূত্রে গ্রোথিত।

পাঠ-সংক্ষেপ

কাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যবসায়কে চারভাগে ভাগ করা যায়। ভাগগুলি হল- শিল্প, বাণিজ্য, শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলী ও প্রত্যক্ষ সেবা।

যে প্রক্রিয়ার প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ এবং বিভিন্ন উপায়ে আহরিত সম্পদের আকার বা রূপগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারোপযোগী পণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে শিল্প বলে।

কৃষি শিল্প, নিষ্কাশন শিল্প ও প্রজনন শিল্প প্রাথমিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ভাবে যে শিল্প, প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে প্রাথমিক শিল্প বলে।

প্রাথমিক শিল্প হতে প্রাপ্ত সম্পদ সমূহকে আরও ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্য যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় তাকে গৌণ শিল্প বলে।

গৌন শিল্প ৬ প্রকার। যথা- উৎপাদন শিল্প, বিশ্লেষণ শিল্প যৌগিক শিল্প, প্রক্রিয়া ভিত্তিক শিল্প, সংযোজন শিল্প ও সংযুক্ত শিল্প।

মানুষের জীবনকে সহজ, নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক করার কাজে নিয়োজিত শিল্পকে সেবা পরিবেশক শিল্প বলে।

শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত পথিমধ্যে যে সব বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা আসে তা দূরীকরণ করার যাবতীয় কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলে।

বাণিজ্যের কার্যক্রমকে পণ্য-বিনিময়, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বীমা, ব্যাংকিং ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়।

বৈদেশিক বাণিজ্য বা পণ্য-বিনিময় তিন প্রকার। যথা- আমদানী, রপ্তানী ও পুনঃরপ্তানী।

পরিবহন বন্টনের স্থানগত বাঁধাদূর করে।

পণ্যের গুদামজাতকরণ বন্টনের সময়গত বাঁধা দূর করে।

বীমা ঝুঁকিগত বাঁধা দূর করে।
ব্যাংকিং অর্থ সংক্রান্ত বাঁধা দূর করে।
বিজ্ঞাপন পণ্য সম্বন্ধে ক্রেতাদের অজ্ঞতা দূর করে।
পণ্য-বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় বন্টনের ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা দূর করে।
বন্টনের ক্ষেত্রে বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতাগুলো হল- ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা, স্থানগত, সময়গত, ঝুঁকিগত, অর্থ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি।
পেশাগত ভাবে প্রত্যক্ষ সেবা বিক্রয় ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট, গায়ক, চাটার্ড একাউনটেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, এটর্নী ফার্ম, ক্লিনিক প্রভৃতি পেশাগত প্রত্যক্ষ সেবার উদাহরণ।
পণ্য গবেষণা, বাজার গবেষণা, বিক্রয়ের কৌশল ইত্যাদি শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক কার্যাবলী হিসেবে পরিচিত।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ঃ ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. ব্যবসায়ের শাখা বা শ্রেণী প্রধানতঃ কয়টি?

ক. ১টি　　খ. ২টি
গ. ৩টি　　ঘ. ৪টি

২. ব্যবসায়ের কোন শ্রেণী পণ্য বন্টনের কাজ করে?

ক. শিল্প　　খ. বাণিজ্য
গ. প্রত্যক্ষ সেবা　　ঘ. ক্রয়-বিক্রয়

৩. বাণিজ্যের ব্যক্তিগত বাঁধাদূর করে কোন্ কাজ?

ক. পণ্য-বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়　　খ. বীমা
গ. ব্যাংকিং　　ঘ. গুদামজাতকরণ

৪. কালগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে কোন্ কাজ?

ক. গুদামজাতকরণ　　খ. পবিরহন
গ. বিজ্ঞাপন　　ঘ. ব্যাংকিং

৫. পণ্য গবেষণা, বাজার গবেষণা ব্যবসায়ের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত?

ক. শিল্প　　খ. বাণিজ্য
গ. শিল্প ও বাণিজ্য সহায়ক কাজ　　ঘ. প্রত্যক্ষ সেবা

৬. আমদানী ও রপ্তানীর মিশ্রণে যে বিনিময় বা বাণিজ্য হয় তাকে কি বলে?

ক আমদানী　　খ. রপ্তানী
গ. পুনঃ রপ্তানী　　ঘ. কোনটিই নয়।

পাঠ ৩ ব্যবসায়ের পরিবেশ ও এর উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবসায়ের পরিবেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর নাম জানতে পারবেন।
- আইনগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক পরিবেশ কিভাবে ব্যবসায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের ব্যবসায়ের পরিবেশ সম্বন্ধে একটি ধারণা পাবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যবসায়ের পরিবেশ কি?

যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায় গড়ে উঠে, তাকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে। যেমন- বাংলাদেশে পাটের উপর ভিত্তি করে পাঠ শিল্পের প্রসার ঘটেছে, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ভিত্তি করে সার কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যে তেলের উপর ভিত্তি করে তেল শিল্পের প্রসার ঘটেছে, জাপান ও আমেরিকায় প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। ব্যবসায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা যে সমস্ত বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে ব্যবসায় গড়ে উঠে সেগুলো হল- ভৌগলিক অবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অবস্থা, সরকারী নিয়মনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। উক্ত সবগুলো অবস্থাই ব্যবসায়ের বাইরের বিভিন্ন উপাদান। উপাদানগুলো ব্যবসায়ের জন্য অনুকুল হতে পারে, আবার প্রতিকূল বা ক্ষতির কারণও হতে পারে। তবে ব্যবসায় কখনো উক্ত উপাদান বা অবস্থাগুলোকে এড়িয়ে চলতে পারে না। ব্যবসায়ের পরিবেশ যেমন একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি একটি দেশের সমস্ত ব্যবসায় খাত ও এর উপর প্রযোজ্য। আবার দেশের ভিতরে সৃষ্ট বিভিন্ন উপাদান যেমন ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে। তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিভিন্ন উপাদান বা অবস্থা বা পক্ষ বা শক্তি (যার উপর প্রতিষ্ঠানের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই) যা ব্যবসায়ের গঠন ও পরিচালনার উপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে, তাকেই ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে।

ব্যবসায়ের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান

আমাদের চারিপাশের বিভিন্ন বস্তুগত, অবস্তুগত, দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান উপাদান নিয়েই আমাদের পরিবেশ গঠিত। এ সমস্ত উপাদানসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্যবসায় যেহেতু মানুষের জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায়, তাই এর উপরও বিভিন্ন উপাদানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। একেই আমরা ব্যবসায়ের পরিবেশ বলে থাকি। নিম্নে ব্যবসায়ের বিভিন্ন উপাদানগুলো আলোচিত হলো ঃ

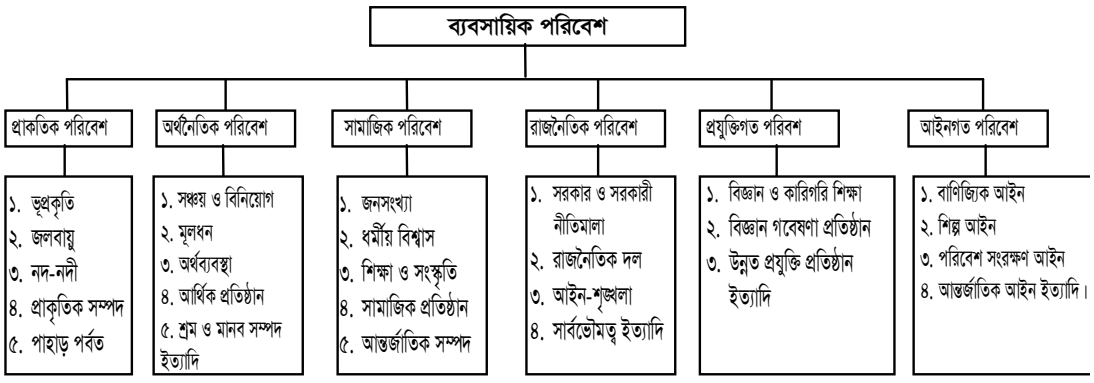

চিত্র ঃ ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং এর উপাদানসমূহ

ক. অর্থনৈতিক পরিবেশ

সঞ্চয় বিনিয়োগ, মূলধন, মানব সম্পদ, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, আয়-ব্যয়, ভোগের পরিমাণ, মূল্যস্তর, প্রাথমিক শিল্প, পবিরহন ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে কোন দেশে যে পরিবেশের দৃষ্টি হয় তাকে অর্থনৈতিক পরিবেশ বলে। ব্যবসায়ের উন্নতি বা অবনতি অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলি যদি ব্যবসায়ের জন্য ইতিবাচক হয় তাহলে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। যে দেশে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ ভাল, মূলধন সংগ্রহ সহজ, অর্থ ও ঋণব্যবস্থা উন্মুক্ত, সেই দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ততই অগ্রগতি লাভ করে। দেশের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ব্যবসায় বাণিজ্যেরও উন্নয়ন ঘটে। ফলে স্বাভাবিক ভঅবেই মানুষের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পায় তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধি পেলে এক দিকে যেমন ভোগের পরিমাণ বাড়ে, অন্য দিকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একই ভাবে বিনিয়োগের পরিমান কম হলে উৎপাদন কম হয়, আয় কম হয়, ভোগ কম হয়, সঞ্চয় কম হয়; এবং বিনিয়োগও কম হয়, ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়ের উন্নতি থেমে যায়। তাই দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর ব্যবসায়ের পরিবেশের অবস্থা নির্ভর করে।

খ. সামাজিক পরিবেশ

সমাজ বলতে পরস্পর নির্ভরশীল মানব গোষ্ঠীকে বুঝানো হয়। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করে। তাদের রুচি, পছন্দ, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, নিয়মকানুন, ধর্মানুভূতি ইত্যাদি মিলে যে পরিবেশ গড়ে উঠে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে। সামাজিক পরিবেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যেকে দারুন ভাবে প্রভাবিত করে। সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো হল ঃ

জনসংখ্যা

একটি দেশের জনসংখ্যা একদিকে ভোক্তা, অন্য দিকে উৎপাদক। দেশের জনসংখ্যা যদি বেশী হয়, তাদেরকে যদি ভোক্তা হিসেবে চিন্তা করা হয় এবং তাদের রুচি, পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করলে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। তাছাড়া তারা যদি দক্ষ জনশক্তি হয় তাহলেও ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। অন্যদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দেগাড়া, বর্ণবাদী ও হীনমন্য সমাজে ব্যবসায় উন্নয়ন বাঁধা প্রাপ্ত হয়।

শিক্ষা-দীক্ষা

সমাজ তথা দেশের মানুষ যদি শিক্ষিত হয় তাহলে তাঁরা বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। অন্যদিকে, অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত জাতি ব্যবসায়ে উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকার দেশ সমূহ অশিক্ষিত বলে তাঁরা ব্যবসায়ে তেমন উন্নতি করতে পারছে না। সেজন্যই বলা হয়- শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

ধর্মীয় অনুভূতি

ধর্মীয় অনুভূতিও ব্যবসায়ে প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে যেমন ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায়, তেমনি ধর্মীয় গোড়ামী, ব্যবসায়ের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত ও করে। আবার ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা থাকায় মুসলিম দেশ সমূহে মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় সম্প্রসারিত হয় না।

জাতি

জাতীয়তাবোধ, জাতিসত্ত্বা, জাতির স্বাস্থ্য অবস্থাও ব্যবসায়-বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। যে জাতির মধ্যে স্বদেশ প্রেম প্রবল, যাদের স্বতন্ত্র জাতি সত্ত্বা আছে, যে জাতির স্বাস্থ্য ভাল, পরিশ্রমি, সে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি অবসম্ভাবী। যেমন জাপানীরা দৈহিক গঠনের দিক থেকে ছোট হলেও তাদের রয়েছে প্রবল দেশ প্রেম, স্বতন্ত্র জাতি সত্ত্বা, সুস্বাস্থ্য, বুদ্ধিমত্তা। তাই তারা শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নত।

গ. রাজনৈতিক পরিবেশ

সরকারের আর্থিক নীতি শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, নীতিমালার স্থায়িত্ব, সরকারী শাসন ব্যবস্থার ধরন, আইন-শৃঙ্খলা, রাজনৈদিক দল সমূহ ও তাদের দর্শন, সরকারের স্থিতিশীলতা, জনগণের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা, দেশের সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি মিলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাকে রাজনৈতিক পরিবেশ বলে। অনুকুল রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নত ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক। কেননা, সরকার স্থিতিশীল হলে, আইন শৃঙ্খলা ভাল থাকলে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে সরকারের ধরন ও সরকারী নীতিমালা অনুকুল ও স্থায়ী হলে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ে এবং বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। এতে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। অন্য দিকে অনুন্নত ও অসহনশীল তথা প্রতিকুল রাজনৈতিক পরিবেশ ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারে বাঁধার সৃষ্টি করে।

ঘ. আইনগত পরিবেশ

সরকারের আর্থিক নীতি, রাজস্বনীতি, বিনিয়োগ নীতি, আমদানী-রপ্তানী নীতি, শ্রম নীতি, মজুরী নীতি, কারখানা আইন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, বিনিয়োগ সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি মিলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাকে আইনগত পরিবেশ বলে। অসাধু ব্যবসায়ীর হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা নিরুৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি বা আইন প্রণয়ন করেন। আর এ আইনের বেড়াজালের মধ্য থেকেই ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। কোন ব্যবসায়ী তার স্বার্থে যা খুশি তাই করতে পারেন না। জনগণ তথা সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই তাকে ব্যবসায় চালাতে হয়। কাজেই আইনগত পরিবেশ ব্যবসায়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশগত পরিবেশ

ব্যবসায়ের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। যে দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যত বেশী উন্নত, সে দেশের শিল্প-বাণিজ্য তথা ব্যবসায় তত বেশী উন্নত। প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যেমন নতুন নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে, তেমনি প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সাহায্যে স্বল্প সময়ে কম খরচে অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। ফলে ব্যবসায়ে উত্তোরাত্তোর উন্নতি ঘটছে এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করছে। আর যারা প্রযুক্তিগত পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না তারা বাজার হারাচ্ছে। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বহু অনুন্নত দেশ এর উদাহরণ।

চ. প্রাকৃতিক পরিবেশ

কোন দেশের ভৌগলিক কাঠামো, আয়তন, অবস্থান, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, জলবায়ু, মৃত্তিকা ইত্যাদি মিলিয়েই তার প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত। প্রাকৃতিক পরিবেশও ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কোন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষি কাজের উপযোগী, ফলে সেদেশে কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠেছে। আবার কোন দেশ বনভূমিতে সমৃদ্ধ, কোন দেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, কোন দেশ মৎস্য চাষে সমৃদ্ধ। এই সকল প্রাকৃতিক সুবিধাাদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল কৃষি প্রধান দেশ। এখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য এখনো তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি। স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্র, তার কিছু কাল পরে ধনতন্ত্রে যাত্রা এই সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের টানা পোড়েন এখানে মিশ্র অর্থনীতির আড়ালে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনি। ব্যক্তিমালিকানায় যা কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাও বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত এবং তাঁদের অগ্রযাত্রা স্তব্দ। অপর দিকে, সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো লোকসানের ভারে হাবু ডুবু খাচ্ছে। আর যেগুলো থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়েছে সেগুলোও হয় বন্ধ হয়েগেছে, নয়তো বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষিকাজের জন্য খুবই উপযোগী হলেও এখানকার কৃষি ব্যবস্থা সেকেলে ও অবৈজ্ঞানিক। এখানে কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানাও তেমন প্রসার লাভ করেনি। ভারত কর্তৃক অভিন্ন নদীতে বাঁধ দেয়ায় এখানকার নৌ পরিবহন ব্যবস্থা ও সেই সাথে গড়ে উঠা গঞ্জ ও বন্দর আজ ক্ষতির সমুক্ষীণ। অবশ্য অবস্থানগত কারণে সামুদ্রিক বন্দরের দিক থেকে সমৃদ্ধ। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অনুমান করা হলেও অর্থের অভাবে তা অনুসন্ধান ও উত্তোলন সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশের অনৈতিক পরিবেশ ব্যবসায়ের জন্য প্রতিকুল বলা যায়। এখানে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ হতাশাব্যঞ্জক। মাথা পিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ কম হবার কারণে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম। কাজেই বিনিয়োগ কম হওয়ায় মূলধন গঠন তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থাও তেমন শক্তিশালী নয়। তাছাড়, এখানে ব্যাংক ঋণ নিয়ে তা মেরে দেয়ার কালচার প্রকট। জাতীয় উন্নতি কথা খুব কম লোকই ভাবে। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য যে ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ থাকার কথা তা এখানে নেই।

জনবহুল এ দেশে আকষর্ণীয় অভ্যন্তরীণ বাজার থাকলেও তাকে ভিত্তি করে তেমন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি। অবাধ আমদানী নীতি ও চোরা চালানের কারণে দেশীয় শিল্পগুলো এগুতে পারছেনা। এর পরও এখানে সহজলভ্য শ্রমিক ও শ্রমিক ব্যয় কম হওয়ায় পোশাক শিল্পে প্রসার লাভ ঘটেছে। জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম সৃষ্টি করা গেলে এবং রাজনৈতিক দলগুলো সদ্দিচ্ছার উদ্রেক হলে এ দেশের শিল্প কারখানার প্রসার ঘটবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বেশ অনুকুল। এখান কার মানুষের চিন্তাধারা বিশ্বাস। রীতি-নীতি ব্যবসায়ের জন্য প্রতিকূল নয়। তবে শিক্ষার হার কম হওয়ায় দক্ষ ও যোগ্য কর্মীর অভাব রয়েছে। এখানে দূর্নীতি বেড়েছে এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে। নুতন নুতন উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠছে না। এ অবস্থায় সামাজিক পরিবেশ উন্নতি ঘটানোর জন্য প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ট সামাজিক নেতৃত্ব।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই হতাশা ব্যঞ্জক। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূদর্শিতা, ব্যক্তি স্বার্থপরতা, গোষ্ঠীপ্রীতি, দল বাজির প্রবণতা, নৈতিকমানের অবনতি ইত্যাদি সমস্যা এখানে প্রকট। রাজনৈতিক হানাহানি, বিশৃংখলা, চাঁদাবাজি, দলীয় করণের মানসিকতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, পেশীশক্তির প্রাধান্য, তথা কথিত রাজনীতিক কর্তৃক দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট ইত্যাদি ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। কথায় কথায় হরতাল, ধর্মঘট, চাঁদাদাবী, দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রসত করছে। তবে আশার কথা হল- বর্তমান গণতান্ত্রিক দেশ প্রেমিক জাতীয়তাবাদী সরকার উক্ত সমস্যা দূর করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে এবং সন্ত্রাস, চাদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় দেশে আইন-শৃংখলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য অনুকুল পরিবেশ নিশ্চিত হবে ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশের আইনগত পরিবেশও ব্যবসায়ের জন্য তেমন ইতিবাচক নয়। তবে বর্তমানে আইন শৃংখলা উন্নয়ন সহ মালিক ও বিশেষ করে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উহা বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিবেশ ও তেমন ভাল নয়। এখানে প্রচুর জনশক্তি থাকার পরও কারিগরি জ্ঞানের অভাব ও উহার ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার কারণে তাদেরকে দক্ষ কারিগরে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গবেষণা তেমন একটা এখানে হয় না। এরূপ জ্ঞানের জন্য আমরা সর্বতোভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। এই অবস্থা থেকে রেহাই পেতে হলে আমাদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা চালিয়ে দেশীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন তথা টেকশই প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশের ব্যবসায়ের জন্য উহার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, প্রযুক্তিগত, সামাজিক পরিবেশ অনুকুলে নয়। কিন্তু এ অবস্থা চলতে পারে না। যেখানে বিশ্ব প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমারা পিছনের দিকে চলছি। এটা জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি। তাই দেশ প্রেমিক সরকার, রাজনৈতিক দল, আমরা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা, প্রশাসন, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সহ সকল জনগণ তথা সূধী সমাজকে ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নে আন্ত রিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠ-সংক্ষেপ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত বিভিন্ন পক্ষ বা শক্তি বা অবস্থা বা বিভিন্ন উপাদান, যা ব্যবসায়ের গঠন, পরিচালনা বা প্রবৃদ্ধির উপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে, তাকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে।

ব্যবসায়িক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান গুলি হলঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনেতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রযুক্তিগত পরিবেশ ও আইনগত পরিবেশ।

আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগবাড়ে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ে। ফলশ্রুতিতে মূলধন গঠন সহজ হয়। যা ব্যবসায়ের জন্য খুবই অনুকুল।

মানুষের রুচি, পছন্দ, শিক্ষাদীক্ষা, মূল্যবোধ, নৈকিতা, সংস্কৃতি, ধর্মানুভূতি ইত্যাদি মিলে সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠে।

সরকারের শাসন ব্যবস্থার ধরন, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, রাজনৈকি দল সমুহের দর্শন, সরকারের স্থিতিশীলতা, জনগণের রাজনীতি চিন্তা-চেতনা, দেশের সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি মিলে রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অনুকুল রাজনৈতিক উন্নত ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক।

সরকারের রাজস্বনীতি, বিনিয়োগ নীতি, আমদানী-রপ্তানী নীতি, শ্রম নীতি, মজুরী নীতি, ক্রেতা অধিকার সংরক্ষণ নীতি, বিনিয়োগ সংরক্ষণ আইন, শিক্ষা সম্পর্ক আইন, কারখানা আইন, বিক্রয় আইন ইত্যাদি মিলে ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন আইনের বেড়াজালের মধ্যে থেকেই ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়।

যে দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানে যত উন্নত সে দেশ ব্যবসায়-শিল্পে ও বাণিজ্যে তত উন্নত।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক সুবিধাদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবসায়ের জন্য অনুকুল হলেও এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্ভর শিল্প-কারখানা তেমন গড়ে উঠেনি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রযুক্তিগত পরিবেশ ব্যবসায়ের জন্য অনুকুল নয়।

বাংলাদেশের হতাশাব্যঞ্জক ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য প্রয়োজন, দেশ প্রেমিক জাতীয়তাবাদী সরকার, রাজনৈতিক দল সমূহের ইতিবাচক রাজনীতি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, প্রশাসন, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সহ সুধীজনের সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াস। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ট নেতৃত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন্ পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত?

ক. সামাজিক　　খ. রাজনৈতিক

গ. অর্থনৈতিক　　ঘ. আইনগত পরিবেশ।

২. মানুষের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কোন্ ধরনের পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত?

ক. সামাজিক　　খ. রাজনৈতিক

গ. অর্থনৈতিক　　ঘ. প্রাকৃতিক পরিবেশ

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কি বোঝায় তা বুঝতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমূহের নাম জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বসমূহ কি, তা জানতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃত নৈতিকতা বা নীতিবোধগুলো কি কি সে সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কি বোঝায়?

ব্যবসায় এবং সমাজ অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা সমাজেই ব্যবসায়ের জন্ম, সমাজেই উহার লালন-পালন এবং সমাজেই উহার বিকাশ ও সম্প্রসারণ। এজন্যই ব্যবসায়কে এখন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যবসায়ের একটি সামাজিক সত্তা রয়েছে। সমাজের মানুষের বিভিন্ন বস্তুগত ও অবস্থাগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাই ব্যবসায়ীর কাজ। যে ব্যবসায় এরূপ অভাব পূরনে ব্যর্থ হয়, সেই ব্যবসায়ীর পক্ষে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এক সময় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল যত বেশী সম্ভব মুনাফা অর্জন করা। বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। মুনাফা অর্জনের সাথে সাথে ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পক্ষ সমূহের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে হয়। যা ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য।

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব সেই সকল দায়বদ্ধতার সংগে সম্পর্কযুক্ত যা পালনের ফলে সমাজের কল্যাণ ও এর অগ্রগতির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বার্থ ও সংরক্ষিত হয়। এ প্রসংগে বিশ্ববিখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশারদ Petter F. Drucker-এর বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন-"ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমন ভাবে পরিচালিত হতে হবে যাতে তা মানব কল্যাণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধন করতে পারে।" এই প্রেক্ষিতেই L. F. Urwick আরও সুন্দর কথা বলেছেন, জীবন ধারণের উদ্দেশ্য যেমন শুধুমাত্র ভোজন করা নয় তেমনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মুনাফা অর্জন নয়।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিস্কার যে, কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা করতে আইনত বাধ্য সেটা করাকে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব পালনের আওতায় ফেলা যায় না। ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন পক্ষ যেমন- ক্রেতা বা ভোক্তা, কাঁচামাল সরবরাহকারী, নিজস্ব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, পাওনাদার, মালিক, সরকার, শ্রমিক-কর্মী, বিনিয়োগকারী, প্রতিবেশী ও সমাজ প্রভৃতি পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা অর্জন ও উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনাকেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলা যায়।

ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমূহ

ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমূহ নিম্নরূপ, যাদের প্রতি ব্যবসায়ের দয়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছেঃ

ক. মালিক বা বিনিয়োগকারী	খ. ক্রেতা বা ভোক্তা
গ. শ্রমিক-কর্মী	ঘ. স্বগোত্রীয় ব্যবসায়
ছ. এলাকাবাসী	জ. সমাজবাসী প্রভৃতি।

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বসমূহ

আধুনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নলিখিত বিভিন্ন পক্ষের প্রতি বিভিন্ন ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্বসমূহ তুলে ধরা হলঃ

১. মালিক বা বিনিয়োগকারীদের প্রতি-দায়িত্ব

বিনিয়োগকারীরা তাদের কষ্টের সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করে মুনাফায়ে প্রত্যাশায়। আর ব্যবসায়ে যদি মুনাফা না হয়ে ক্ষতি হয় তাহলে সে ব্যবসায় বেশীদিন টিকতে পারে না। তাই ব্যবসায়ের সর্ব প্রধান দায়িত্ব হল বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা। বিনিয়োগকারীদের প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্ব হলঃ

বিনিয়োগকৃত অর্থের যুক্তিযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনা;
কাম্য মুনাফা অর্জন ও তা বিতরণ করা;
যথাযথ ভাবে ব্যবসায়ের হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও পেশ করা;
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার;
বিনিয়োগকারীদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

২. শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্ব-

ব্যবসায়ের প্রাথমিক উন্নতি নির্ভর করে শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিশ্রমের উপর। তাই তাদের সন্তুষ্ট ও কর্মচঞ্চল রাখার জন্য তাদের প্রতি ব্যবসায় নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেঃ

আন্তরিকতা পূর্ণ ব্যবহার;
ন্যায্য মজুরি প্রদান;
সুষ্ঠু কার্যপরিবেশ গড়ে তোলা;
পরিবহন বাসস্থান ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা;
ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা;
চাকুরী শেষে ভবিষ্যৎ আর্থিক নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা।

৩. ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি দায়িত্ব

ক্রেতা বা ভোক্তারা হল ব্যবসায়ের প্রাণ, অন্য কথায়, ভোক্তাদের কে বলা হয় রাজা। কারণ ক্রেতারা পণ্য কিনলে ব্যবসায় টিকে থাকবে, আর তারা পণ্য পছন্দ না করলে উৎপাদন অর্থহীন অর্থাৎ ব্যবসায় মারা যাবে। ভোক্তারা সমাজের একটি বড় অংশ। কাজেই ভোক্তাদের বাড়তি সহযোগিতার আশায় ব্যবসায় তাদের প্রতি নিম্নোক্ত ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেঃ

ন্যায্যমূল্যে উন্নত মানের পণ্য সরবরাহ করে;
পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা;
পণ্যের সরবরাহ সারা বৎসর নিশ্চিত করা;
নুতন নুতন পণ্য উৎপাদন করে ক্রেতাদের সর্বোচ্চ তৃপ্তি নিশ্চিত করা;
পণ্য ও বাজার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ ও উপদেশ প্রদান করা ইত্যাদি;

৪. সরবরাহকারী এবং পাওনাদার / ঋণ দাতাদের প্রতি দায়িত্ব

সরবরাহকারীদের কাঁচামালের ন্যায্যমূল্য প্রদান;
ঋণদাতাদের ঋণের টাকা বা পাওনাদারদের প্রাপ্য টাকা যথা সময়ে পরিশোধ করা;
ঋণের সুদ নিয়মিত পরিশোধ করা ইত্যাদি।

৫. সরকারের প্রতি দায়িত্ব

ব্যবসায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হল সরকার। দেশের ব্যবসায় তথা শিল্প-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সরকারের যেমন দায়িত্ব রয়েছে। তেমনভাবে ব্যবসায়েরও দায়িত্ব রয়েছে সরকারের প্রতি। কারণ সবাইকে নিয়েই সরকার। ব্যবসায় সরকারের প্রতি যে সকল দায়িত্ব পালন করতে পারে তাহলঃ

সরকারী আইন-কানুন ও রীতিনীতি মেনে চলা;
সরকারকে সর্বোচ্চ কর ও রাজস্ব প্রদান করা;
বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে মুদ্রা নীতি, রাজস্বনীতি, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী সকল কার্যকল্যাণ থেকে বিরত থাকা;
ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৬. এলাকাবাসীদের প্রতি দায়িত্ব

যে স্থানে বা যে এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপিত হয় সেই এলাকার জনগণের জন্য কিছু করা ব্যবসায়ের জরুরী দায়িত্ব রয়েছে। কারণ কারখানার শব্দ, ধোয়া ও আবর্জনা এলাকার পরিবেশকে দারুন ভাবে দূষিত করে। তাই এলাকার প্রতি ব্যবসায়ের করণীয় হলঃ

রাস্তাঘাট উন্নয়নে সহায়তা করা;
স্কুল, কলেজ, পাঠাগার, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির হাসপাতাল, ক্লাব ইত্যাদি নির্মাণ করা;

ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ত্রাণ ও পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
তাদেরকে প্রয়োজনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার জন্য বৃক্ষরোপন সহ অন্যান্য কল্যাণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

৭. সমাজের প্রতি দায়িত্ব

সমাজ ও সমাজের মানুষকে ঘিরেই ব্যবসায় এবং এর কার্যাবলী আবর্তিত হয়। সমাজ হতে নানা রকম সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেই ব্যবসায় সমৃদ্ধ হয়। কারণ ব্যবসায়ের কাঁচামাল আসে সমাজ থেকে, মূলধন আসে সমাজ থেকে, শ্রম আসে সমাজ থেকে। কাজেই সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। তাই নিম্নোক্ত উপায়ে ব্যবসায় সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারেঃ

সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন ও সরবরাহ;
পণ্যে ভেজাল না দেয়া;
ওজনে কম না দেয়া;
জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
চোরাকারবারী, মুনাফাখোরী ও ফটকাবাজী হতে বিরত থাকা;
পণ্যের জন্য ন্যায্য মুল্য নির্ধারণ করা;
জাতীয় সম্পদের সম্ভব সর্বোচ্চ ব্যবহার করা;
হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান গঠন করা বা গঠনে সহায়তাদান করা;
জনগণকে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতন করা;
সমাজ কল্যাণে মুনাফার কিছু অংশ ব্যয় করা;
দুর্যোগের সময় ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করা;
খেলাধুলায় পৃষ্ঠপোশকতা করা ইত্যাদি।

৮. স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি দায়িত্ব

অসুস্থ্য ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করার জন্য স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি ও ব্যবসায়ের দায়িত্ব রয়েছে। কারণ অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার ফলে সমাজ তথা দেশেরই ক্ষতি হয়। কাজেই প্রত্যেক ব্যবসায়ীর প্রতি প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কিছু দায়িত্ব রয়েছে। এগুলো হলোঃ

স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে সমিতি গঠন করা;
অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়া;
ব্যবসায়ীদের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান করা;
পারস্পরিক সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

ব্যবসায়ের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

ব্যবসায় সমাজবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হওয়ায় এরূপ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিষয়টি এর আগে তেমন গুরুত্ব না পেলেও বর্তমানে তা সর্বত্রই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

মূল্যবোধ হল কোন বিষয়ের উপর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ধারণা। এটা মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মনোভাব পরিবর্তনের সাতে মূল্যবোধ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। আর নৈতিকতা ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ও বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা অর্জন ও উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনাকেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলে।

ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষে প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা অর্জন, ও উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনাকেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলে।

ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমুহ, যাদের প্রতি ব্যবসায়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছে, তাঁরা হল; মালিক বা বিনিয়োগকারী, শ্রমিক-কর্মচারী, ক্রেতা বা ভোক্তা, কাঁচামাল সরবরাহকারী, ঋণদাতা, সরকার, স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, এলাকাবাসী, সমাজবাসী প্রভৃতি।

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব সমূহ হলঃ বিনিয়োগকারীদের মূলধনের কাম্য ব্যবহার ও মূলধনের নিরাপত্তা বিধান করা, কাম্য মুনাফা অর্জন ও বিতরণ, শ্রমিকদের প্রতি উত্তম ব্যবস্থার ও তাদের ন্যায় মজুরী ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, বোক্তাদের জন্য ন্যায্য মূল্যে উত্তম পণ্য যথা সময়ে সরবরাহ করা, পাওনাদারদের পাওনা যথা সময়ে নিশ্চিত করা, সরকার কে কর ফাঁকি না দেয়া, এলাকাবাসীদের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদাসা, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরী করা প্রভৃতি।

মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মনোভাব, ধর্মানুভুতি ইত্যাদি পরিবর্তনের সাথে মূল্যবোধ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

মূল্যবোধ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হতে পারে।

ধনাত্মক মূল্যবোধ ব্যবসায়ের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ অথবা কোনটি উচিৎ বা কোন্‌টি অনুচিত তা স্পষ্টভাবে বিচার করে ভালটি বা উচিৎটি গ্রহণ করা। নীতিবোধ মূলতঃ সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মূল্যবোধ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে। কিন্তু নৈতিকতা সব সময় ধনাত্মক। মূল্যবোধ পরিবর্তশীল। যেমন- যত বেশী সম্ভব মুনাফা অর্জন এক সময় ব্যবসায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এটা ঋণাত্মক মূল্যবোধ। বর্তমানে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজ সেবাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এটা ধনাত্মক মূল্যবোধ। সততা, ন্যায় পরায়ণতা, সহযোগিতা, শৃঙ্খলা, একতা, ঔচিত্যবোধ, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি নৈতিকতার উদাহরণ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে নৈতিকতা সম্পন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, ব্যবসায়ী যদি নৈতিকতা বিবর্জিত হয় তাহলে দেশ তথা সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন- চোরাকারবারী, ক্ষতিকর দ্রব্য উৎপাদন, মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় ইত্যাদি। এ সমস্ত ব্যবসায় সমাজের প্রতিটি লোকের জন্য ক্ষতিকর। ব্যবসায়ী যদি নৈতিকতার সাথে কাজ করে তাহলে সরবরাহকারী, ভোক্তা, শ্রমিক, কর্মচারী, সমাজ সরকার বিনিয়োগকারী, সাধারণ জনগণ প্রত্যেকেই উপকৃত হবে। জাতীয় উন্নয়ন ঘটবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী স্থান করে নিতে পারবে।

সুতরাং, ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ব্যবসায়ীকে সৎ, ন্যায়-পরায়ণ, বিশ্বাসী ও আস্থাত্যয়ী করে তোলে। এর মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন, অশুভ প্রতিযোগিতা রোধ ও সামাজিক প্রত্যাশা পূরণ সম্ভভ হয়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে সকল মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সকল সমাজেই স্বীকৃতি লাভ করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১. বৈধ উপায়ে ব্যবসায় পরিচালনা করা এবং সকল ধরনের অবৈধ ব্যবসায় ও কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা;
২. সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ উৎপাদন, বন্টন, শ্রমিক নিয়োগ, প্রমোশন, সবকিছুতে সততা ও ন্যায়নীতি বজায় রাখা ও নির্ভরতার গুণ অর্জন করা;
৩. ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করা;
৪. বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি না করা এবং পণ্য মূল্য স্থিতিশীল রাখা;
৫. যে কোন ধরনের প্রতারণা, শঠতা ও ধোকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ না করা;
৬. ক্রেতা বা ভোক্তাদের চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা;
৭. পণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে যৌক্তিক মুনাফা যোগ করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা;
৮. উন্নত মানের পণ্য তৈরী ও সরবরাহ করা;
৯. ক্রেতা বা ভোক্তা তথা সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন পণ্য সামগ্রী যেমন- মাদক দ্রব্য, বিড়ি, সিগারেট, আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি উৎপাদন বা বিক্রয় না করা;
১০. এক চেটিয়া ব্যবসায় না করা বা একচেটিয়া ব্যবসায়ী হওয়ার প্রবণতা পরিহার করা;
১১. জীবন যাত্রার ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ন্যায্য মজুরী নির্ধারণ করা।
১২. শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।
১৩. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নুতন নুতন শিল্প কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
১৪. সরকারের আর্থিকনীতি, রাজস্বনীতি, আমদানী-রপ্তানীনীতি, শিল্পনীতি, করনীতি ইত্যাদি মেনে ব্যবসায় করা।
১৫. পরিবেশ দূষণ হয় বা হতে পারে এমন শিল্প কারখানায় দূষণ রোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৬. পরিবেশ বান্ধব শিল্প-কারখানা তৈরী করা এবং পরিবেশের ক্ষতি করে এমন পণ্য যেমন পলিথিন ব্যাগ তৈরী না করা।
১৭. সকলের পাওনা যথা সময়ে পরিশোধ করা।
১৮. ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা মেরে দেয়ার চেষ্টা না করা।
১৯. সরকারকে কর ফাঁকি না দেয়া এবং খাজনা, ভ্যাট, এক্সাইজ ইত্যাদি ঠিকমত পরিশোধ করা।
২০. স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের সাথে অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়া।
২১. রাস্তাঘাট, পুল, কাল ভার্ট তৈরী, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তৈরী, হাসপাতাল তৈরী, ইত্যাদি জনহিতকর কাজে মুনাফার একটি অংশ ব্যয় করা।

পাঠ-সংক্ষেপ

জীবন ধারণের উদ্দেশ্য যেমন শুধুমাত্র ভোজন করা নয়, তেমনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মুনাফা অর্জন করা নয়। কোনটি উচিত বা কোনটি অনুচিত তা স্পষ্টভাবে বিচার করে ভালটি বা উচিৎটি গ্রহণ করাকেই নৈকতকতা বলে। নৈতিকতা সব সময়ই ধনাত্মক।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে নৈতিকতা সম্পন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রধান প্রধান মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমূহ হল- বৈধ উপায়ে ব্যবসায় পরিচালনা, উৎপাদন ও বন্টনসহ সকলক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়নীতি বর্জায় রাখা, বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না করা, যে কোন ধরনের প্রতারণা, শঠতা ও ধোকা বাজির আশ্রয় গ্রহণ না করা; ভোক্তা বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর পণ্য দ্রব্য উৎপাদন না করা, একচেটিয়া প্রবণতা পরিহার করা, শ্রমিক-কর্মীদের জন্য ন্যায্যমজুরী নির্ধারণ করা, পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করাও পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদন করা, সরকারকে কর ফাঁকি না দেয়া এবং স্বগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের সাথে অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা না করা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৪

১. নিচের কোনটি নৈতিকতার উদাহরণ নয়?
   ক. বৈধভাবে ব্যবসায় চালান — খ. পরিবেশ দূষণ রোধ
   গ. ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন না করা — ঘ. সরকারকে কর ফাঁকি দেয়া

২. নিচের কোন্‌টি ঠিক?
   ক. নৈতিকতা সর্ব সময়ই ধনাত্মক — খ. নৈতিকতা ঋণাত্মক
   গ. ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয়ই — ঘ. কোনটি নয়।

৩. নিচের কোনটা ঠিক?
   ক. মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল — খ. মূল্যবোধ স্থির
   গ. উপরের দুটোই — ঘ. কোনটিই নয়।

৪. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব নয় কোনটি?
   ক. পণ্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ — খ. শ্রমিকদের সাথে উত্তম ব্যবহার
   গ. স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা — ঘ. অন্যান্য ব্যবসায়ীর সাথে অন্যায় প্রতিযোগিতা করা।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.১ ১.গ ২.ঘ ৩.খ ৪.ক ৫.গ ৬.ক ৭.খ ৮.ক ৯.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.২ ১.গ ২.খ ৩.ক ৪.ক ৫.গ ৬.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৩ ১.খ ২.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৪ ১.ঘ ২.ক ৩.ক ৪.খ

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিন। এর প্রকৃতি আলোচনা করুন।
২. ব্যবসায়ের আওতা আলোচনা করুন।
৩. ব্যবসায়ের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৪. সংক্ষেপে ব্যবসায়ের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৫. শিল্পের শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।
৬. বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা গুলো কি কি? উহা কিভাবে দূর করা যায়।
৭. প্রত্যক্ষ সেবা কর্মগুলো কি কি?
৮. ব্যবসায়িক পরিবেশ কাকে বলে? এর উপাদানসমূহ কি কি?
৯. বিভিন্ন পরিবেশ কিভাবে ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে আলোচনা করুন।
১০. ব্যবসায় কি ভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে?
১১. সমাজে স্বীকৃতি ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমূহ বর্ণনা করুন।